নবায়নযোগ্য জ্বালানি : প্রযুক্তির অগ্রগতি বনাম বাংলাদেশের উল্টো যাত্রা

মওদুদ রহমান ও মাহা মির্জা

লেখাটি এ বছরের এপ্রিল মাসে ঢাকা ট্রিবিউন পত্রিকায় "High price, low quality hold back solar energy in Bangladesh", "Reliance on fossil fuels makes Bangladesh an outlier", এবং "Bangladesh's policies lack ambition, clarity on solar power" শিরোনামে প্রকাশিত তিনটি ধারাবাহিক লেখার পরিমার্জিত ও হালনাগাদকৃত অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন **শোয়েব করিম**।

সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের গত প্রায় দুই দশকের যাত্রায় বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৪৫ লাখেরও বেশি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সৌর বিদ্যুতের বাজারে পরিণত করেছে। তবে এই সংখ্যা উপস্থাপনের মারপ্যাঁচে অধিকাংশ সময়েই কিছু রূঢ় বাস্তবতা আড়াল করে রাখা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশে আমদানি হওয়া এই সোলার হোম সিস্টেমগুলোর অধিকাংশই নিম্নমানের এবং প্রকৃত সৌর বিদ্যুতের প্রসারে এর অবদান আশানুরূপ নয়। মানহীন এইসব সিস্টেমের উচ্চমূল্যের কারণে ভোক্তাদের পকেট কাটা চলছেই, কিন্তু দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে এখনও পর্যন্ত এর কোন উল্লেখযোগ্য অবদান নেই।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী মাহবুব সুমনের মতে, বাংলাদেশে গত দশকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যেসব সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে সেগুলোর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা মাত্র ২০ থেকে ৫০ ওয়াট, যা দিয়ে কেবল দু-একটা বাল্ব আর ফ্যান চালানো সম্ভব। আধুনিক যে সোলার প্যানেল বিশ্বজুড়ে ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলোর জ্বালানি কর্মদক্ষতা (প্যানেল এফিশিয়েন্সি) ২২%। অথচ বাংলাদেশের বাজার ১০-১২% প্যানেল এফিশিয়েন্সিতে আটকে আছে। ফলে দেশজুড়ে সোলার প্যানেল বিতরণের দুই দশক পার হয়ে গেলেও বাংলাদেশে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অবদান মাত্র ০.০৭%! পাওয়ার সেলের সাবেক মহাপরিচালক প্রকৌশলী বি ডি রহমতুল্লাহর মতে, নিম্নমানের সোলার প্যানেলের উচ্চমূল্যের কারণে গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে এখন নবায়নযোগ্য জ্বালানির ধারণাই অজনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তিনি বলেন, "গ্রামের প্রতিটি পরিবারকে সোলার হোম সিস্টেমের জন্য অধিক খরচে বাধ্য না করে পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড দেশজুড়ে মিনিগ্রিড ও মাইক্রোগ্রিড ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিতে পারে। এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সৌর বিদ্যুতের স্বল্পমূল্য নিশ্চিত করা যাবে।

এদেশে সোলার হোম সিস্টেমের প্রসার, বিতরণ ও স্থাপনের কাজ করছে মূলত রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (IDCOL) এবং এতে রেজিস্টার্ড স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি। ইডকলের সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর একাধিক কর্মকর্তার মতে, গত ২০ বছরে ফুলেফেঁপে ওঠা সোলার হোম সিস্টেমের বাজারের ওপর সরকারি নজরদারির মারাত্মক অভাব ছিল; যার ফলে নিম্নমানের সোলার প্যানেল আর ব্যাটারির জঞ্জালে বাজার সয়লাব হয়ে গেছে। সম্প্রতি কাজের বিনিময়ে টাকা প্রকল্পের আদলে বিনা মূল্যে সোলার প্যানেল বিতরণের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইডকলের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের একজন নির্বাহী কর্মকর্তার মতে, সরকারের বিনা মূল্যে প্যানেল বিতরণ প্রকল্প কেবল বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থায়ই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেনি, বরং বিতরণ ব্যবস্থার মধ্যেও ব্যাপক দুর্নীতির জন্ম দিয়েছে। কাজের বিনিময়ে টাকা প্রকল্পের আওতায় বিতরণকৃত প্যানেলের বেশির ভাগই যাচ্ছে স্থানীয় প্রভাবশালীদের ঘরে; যার ফলে বিদ্যুৎ সুবিধার বাইরে থাকা পরিবারগুলো বরাবরের মতই বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে।

বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিয়ে ব্যাপক হৈচৈ হলেও বায়োমাস, সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎ–সব মিলিয়ে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা এখন পর্যন্ত মাত্র ২৪২ মেগাওয়াট! সরকার ২০২১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে মোট ২,৬৬৬ মেগাওয়াট উৎপাদন সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, যা হবে তখনকার মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ১১%! অন্যদিকে প্রতিবেশী দেশ ভারতের নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা দিন দিন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে।

ছক ১ : বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা এবং প্রকৃত উৎপাদিত বিদ্যুৎ

দেশ	মোট উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	বাঁধভিত্তিক জল বিদ্যুৎ ব্যতীত মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	বাঁধভিত্তিক জল বিদ্যুৎ ব্যতীত নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের শতকরা হার
বাংলাদেশ	১৬,২৮৮	২৪২	০.০৭%
ভারত	৩১০,০০৫	৪৫,৯১৬	৬%
বিশ্বজুড়ে সর্বমোট	৬,১৮০,০০০	৯২১,০০০	৬.৪০%

তথ্যসূত্র : SREDA, IEA Sankey Diagram, Government of India Annual Report 2016-17, World Energy Council Report 2016, Renewables 2017 Global Status Report

ভারত ২০২২ সালের মধ্যে ১ লাখ ৬০ হাজার মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যানে ২০৪১ সালের মধ্যে মাত্র ৩% বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদিত হতে পারার সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ভারত ২০৩০ সালের মধ্যেই মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ৪০% বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। একইভাবে জার্মানির বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৩১% আসছে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে তা ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। জার্মানি ও ফ্রান্সের মত ব্যাপকভাবে শিল্পায়িত দেশ, এমনকি ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশ যখন জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে এসে দীর্ঘ মেয়াদে সস্তা নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারের ছক কাটছে, তখন বাংলাদেশ সরকার কয়লা ও পরমাণু বিদ্যুৎ প্রসারের পরিকল্পনা নিয়ে সম্পূর্ণ উল্টো পথে হাঁটা শুরু করেছে।

দেশে দেশে কেন কয়লা আর পরমাণু বিদ্যুৎকে সরিয়ে সৌর, বায়ু, বায়োমাস ভিত্তিক বিদ্যুতের প্রসার হচ্ছে তা বোঝাটা খুব দুষ্কর নয়।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির নিয়ত কমতে থাকা খরচের যে চিত্র বিভিন্ন গবেষণা ও কার্যক্ষেত্রে উঠে আসছে তা দিয়ে এ বিষয়টি খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়।

ছক ২ : সরকারি ভর্তুকি ব্যতীত বিশ্বজুড়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের মূল্য (১ মার্কিন ডলার=৮০ টাকা ধরা হয়েছে)

প্রযুক্তি	প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য (টাকা)	
	২০১০	২০১৭
সোলার প্যানেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ	২৮.৮	৮
অফশোর বায়ু বিদ্যুৎ	১৩.৬	১১.২
অনশোর বায়ু বিদ্যুৎ	৬.৪	৪.৮
বায়োমাস	৫.৬	৫.৬

ইন্টারন্যাশনাল রিনিউয়েবল এনার্জি এজেন্সি (IRENA) সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে দেখিয়েছে যে সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎ–দুই ক্ষেত্রেই মেগাওয়াট প্রতি স্থাপন ও উৎপাদন কমেছে। সৌর বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ২০১০ সালে প্রতি মেগাওয়াট সক্ষমতার বিপরীতে নির্মাণ ব্যয় ছিল ৩৫ কোটি টাকা। বর্তমানে এই ব্যয় কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১১ কোটি টাকায়। ২০১০ সালে প্রতি মেগাওয়াট সক্ষমতার অনশোর উইন্ড টারবাইন স্থাপনে ব্যয় ১৫ কোটি থেকে ১২ কোটি টাকায় নেমে এসেছে। সোলার প্যানেল ভিত্তিক প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় কমেছে ২০১০ সালের তুলনায় ৭২%। ভারতেও চলমান বেশির ভাগ কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনার চেয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন এখন কম ব্যয়বহুল। বর্তমানে সেখানে সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় ইউনিটপ্রতি ৩.৫ টাকারও কম। ব্যাটারি হচ্ছে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। দিন দিন এর দামও কমছে। ২০০৭ থেকে ২০১৪ সালের ব্যবধানে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির দাম কমেছে ১৪% এবং এই দাম আরও কমবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

২০১৬-১৭ সালে ভারতে নির্মাণাধীন নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্রের সক্ষমতা নির্মাণাধীন কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের সক্ষমতাকে প্রথমবারের মত ছাড়িয়ে গেছে। ভারতের সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি ২০২৭ সালের মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার মেগাওয়াট সক্ষমতার কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অথচ বাংলাদেশ সস্তা বিদ্যুতের পথে না হেঁটে রামপাল ও রূপপুরের মত ব্যয়বহুল কয়লা ও পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। নির্মাণ ও পরিচালনায় মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় ছাড়াও কয়লা ও পারমাণবিক–উভয় বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্ষেত্রেই আছে আরও নানা ধরনের অপ্রত্যক্ষ ব্যয়, যেমন–কয়লা আনা-নেয়ার জন্য রেলপথ নির্মাণ, ভারী যন্ত্রপাতি পরিবহনের জন্য নৌরুট তৈরি, নিয়মিত ড্রেজিং, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য এ পর্যন্ত বরাদ্দকৃত ব্যয় ধাপে ধাপে বেড়ে ১ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। নির্মাণকাজ পুরোপুরি শেষ হওয়া পর্যন্ত ব্যয়, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিয়মিত খরচ এবং বিদ্যুৎকেন্দ্রের মেয়াদ শেষে ডিকমিশনিংয়ের ব্যয় মিলিয়ে হিসাব করলে এই বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রকৃত দাম হবে আকাশছোঁয়া। অন্যদিকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এজাতীয় অপ্রত্যক্ষ খরচ নেই বললেই চলে। এতে পরিবেশের ক্ষতি হওয়ারও কোন আশঙ্কা নেই, নেই কোন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার বাড়তি খরচ। উল্লেখ্য, কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রজনিত দূষণের বৈশ্বিক ব্যয় এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ২০১৩ সালে চীন শহরগুলোতে ক্রমে বেড়ে চলা প্রাণঘাতী দূষণের মোকাবেলায় পরবর্তী ৫ বছরে ২৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দ্য হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অ্যালায়েন্সের 'Hidden Price Tags' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ২০১৩ ও ২০১৪ সালে তেল, গ্যাস ও কয়লা খাতে ভারত ১৬.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ভর্তুকি দেয়, বিপরীতে সেখানে বায়ুদূষণ সংশিষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকি ব্যয় ছিল ১৪০.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয় যে জি ২০ ভুক্ত দেশগুলোর সরকার ২০১৪ সালে জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানিগুলোকে ৪৪৪ বিলিয়ন ডলার ভর্তুকি দেয়, কিন্তু এর ফলে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় ছিল ২.৭৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ভর্তুকি মূল্যের চেয়ে ছয় গুণ বেশি। অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের মতে, জীবাশ্ম জ্বালানির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিমাণে ভর্তুকিই এটিকে এখনও পর্যন্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে সস্তা করে রেখেছে। বিশ্বজুড়ে যখন নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যয় ক্রমশ কমছে, তখন বাংলাদেশের প্রান্তিক ব্যবহারকারীরা সৌর বিদ্যুতের জন্য উচ্চমূল্য গুনতে বাধ্য হচ্ছে। বেসরকারি কোম্পানিগুলো গ্রামাঞ্চলে ইউনিটপ্রতি বিদ্যুৎমূল্য ৩০ টাকা পর্যন্ত ধার্য করছে, যেখানে শহরে বিদ্যুতের মূল্য এর চেয়ে প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ।

সম্প্রতি বাংলাদেশে বেশ কটি বেসরকারি কোম্পানিকে ৩০ থেকে ২০০ মেগাওয়াট উৎপাদন সক্ষমতার বেশ কয়েকটি সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ দেয়া হয়েছে। অভিযোগ আছে, এই দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিগুলো হয়েছে অত্যন্ত অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায়। এর ফলে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে ইউনিটপ্রতি ১২ টাকা মূল্যে সৌর বিদ্যুৎ কিনতে হবে অন্তত আগামী ২০ বছর পর্যন্ত। অদূর ভবিষ্যতে সৌর বিদ্যুতের মূল্য যখন ব্যাপক হারে কমবে, তখনও সরকারকে এই নির্ধারিত মূল্যেই আটকে থাকতে হবে, যে মূল্য ভারতের তুলনায় এখনই প্রায় চার গুণ বেশি! কেবল এই প্রাইভেট কোম্পানিগুলোর জন্য একচেটিয়া ব্যবসায়বান্ধব চুক্তি নয়, বরং ২০৪১ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের যে মহাপরিকল্পনা করা হয়েছে, তার মাধ্যমে বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারের রাস্তাটাই সংকুচিত করে ফেলা হয়েছে। পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান ২০১৬-তে সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে ৩৫% বিদ্যুৎ কয়লা থেকে এবং ১০% বিদ্যুৎ পরমাণু শক্তি থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। বলা হয়েছে, ২০৪১ সালের মধ্যে ১৫% বিদ্যুৎ মিশ্রভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং আমদানীকৃত উৎস থেকে উৎপাদন করা হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং আমদানীকৃত উৎসের এই মিলিয়ে দেখানো হিসাবের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রকৃত অংশ যে আসলে কত হবে সেটা বোঝা দুষ্কর হয়ে উঠেছে। তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্যসচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের মতে, পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্যানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি লক্ষ্যমাত্রার এটা একটা প্রতারণাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এর ফলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোটা আমদানীকৃত বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমেই পূরণ করার সুযোগ রেখে দেয়া হয়েছে।

জি ২০ ভুক্ত দেশগুলোর সরকার ২০১৪ সালে জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানিগুলোকে ৪৪৪ বিলিয়ন ডলার ভর্তুকি দেয়, কিন্তু এর ফলে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় ছিল ২.৭৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ভর্তুকি মূল্যের চেয়ে ছয় গুণ বেশি।

সাসটেইনেবল অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (SREDA) পরিচালক শেখ রিয়াজ আহমেদ বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের উন্নয়নের পথে SREDA-র ক্ষমতায়নের অভাবকে একটা বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যদিও SREDA বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির মূল সমন্বয়ক কর্তৃপক্ষ, তবু দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিস্তারের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানকে সীমিত ক্ষমতাই দেয়া হয়েছে। প্রকৌশলী বি ডি রহমতুলাহও প্রায় একই মতামত ব্যক্ত করেছেন, তিনি SREDA-কে নখদন্তহীন বাঘের সাথে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে, SREDA-র ক্ষমতা বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বেঁধে দেয়া হয়েছে।

দীর্ঘ দুই বছরব্যাপী আলোচনা, মতবিনিময় ও গবেষণা অনুসন্ধান শেষে গত বছর এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি বাংলাদেশের জন্য সরকার ঘোষিত জ্বালানি নীতির বিকল্প প্রস্তাব উপস্থাপনকালে জানায় যে ১১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেই ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ৫৫% বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদন করা সম্ভব। গবেষণায় প্রাপ্ত এই উপাত্ত সরকারি মহলে বরাবরের মতই 'অবাস্তব উচ্চাকাঙ্ক্ষা' বলে আগ্রাহ্য করা হয়েছে; যদিও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একাধিক গবেষণা সংস্থার সাম্প্রতিক গবেষণায় জাতীয় কমিটি উপস্থাপিত চিত্রের কাছাকাছি ফলই পাওয়া গেছে।

ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকোনমিকস অ্যান্ড ফাইন্যানশিয়াল অ্যানালাইসিস (IEEFA)-এর প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশে ২০৪১ সালের মধ্যে ৩৮০ টেরাওয়াট-আওয়ার বিদ্যুৎ কেবল সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব, যা সে সময়ের প্রাক্কলিত মোট চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক একটি যুগান্তকারী গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। গবেষণাটি খতিয়ে দেখতে চেয়েছে যে বিদ্যমান এবং কিছু ক্ষেত্রে উন্নততর প্রযুক্তির মিশেল ব্যবহার করে বাছাইকৃত ১৩৯টি দেশের বিদ্যুৎ সংকট শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে মেটানো আর্থিক এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সম্ভবপর কি না। এই গবেষণায় উঠে এসেছে, ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ চাহিদার শতভাগ যে কেবল নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে মেটানো সম্ভব শুধু তাই নয়, বরং এই সমাধান হবে অন্যান্য বিকল্পের চেয়েও বেশি সাশ্রয়ী। এর ফলে সে সময়ে বর্তমান মুদ্রামানে ইউনিটপ্রতি বিদ্যুতের দাম দাঁড়াবে প্রায় ৬ টাকা, যাতে ব্যক্তিপ্রতি বিদ্যুৎ খরচ বছরে ২ হাজার টাকা করে কমে যাবে।

সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য বিপুল পরিমাণ জমির প্রয়োজন হবে বলে একটি ভুল ধারণা এখনও বহুল প্রচলিত। SREDA-র পরিচালক শেখ রিয়াজ আহমেদের মতে, উপযুক্ত জমির অভাব এবং অধিগ্রহণজনিত জটিলতাই নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে প্রধান বাধা। যদিও প্রখ্যাত ভারতীয় গবেষক সৌম্য দত্তের মতে, বিদ্যমান প্রযুক্তিতেই কৃষিজমিতে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। তিনি বলেন, "ইতোমধ্যেই এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে একই জমিতে সোলার শেয়ারিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষিকাজ এবং সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব।" যদিও সাধারণত ধারণা করা হয় যে ১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম সোলার প্যানেল বসাতে ৩.৫ একর জমির প্রয়োজন। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, ১ মেগাওয়াট ক্ষমতার সোলার প্যানেল বসাতে সর্বোচ্চ ২ একর জমিই যথেষ্ট। জার্মানির ফেডারেল মিনিস্ট্রি অব ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড ডিজিটাল অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, ১.৭ একর জমি ব্যবহার করেই ১ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। কিছুদিন আগেও যে ভাসমান সোলার প্যানেলের মত উদ্ভাবনী প্রযুক্তিকে অসম্ভব মনে করা হত তা এখন চীন ও ভারতের মত দেশেও বাস্তবায়িত হচ্ছে। এমনকি বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডও কাপ্তাইয়ে একটি ১০ মেগাওয়াট ভাসমান সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে যুগান্তকারী অগ্রগতি, যার ফলে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য অধিক জমির প্রয়োজনীয়তার আবশ্যকতা দূর হয়েছে। বি ডি রহমতুল্লাহর মতে, অনাবাদি এবং অবৈধভাবে দখলকৃত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন খাসজমি ও জলাভূমিকে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশে ০.৮ মিলিয়ন একর খাস কৃষিজমি, ১.৭ মিলিয়ন একর অনাবাদি খাসজমি এবং ০.৮ মিলিয়ন একর জলাধার রয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, কেবল অনাবাদি খাসজমি ব্যবহার করেই কমপক্ষে ৫ লাখ মেগাওয়াট সক্ষমতার সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব, যা বাংলাদেশের বর্তমান সক্ষমতা থেকে প্রায় ৩১ গুণ বেশি।

ভারতের প্রখ্যাত জ্বালানি বিশেষজ্ঞ শংকর শর্মার মতে, বাংলাদেশে বিস্তীর্ণ জমি নিয়ে খুব বড় বড় সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রয়োজন নেই। ভূমির অপ্রতুলতা বিবেচনায় সৌর বিদ্যুতের বিকেন্দ্রীভূত উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থাই বাংলাদেশের জন্য উপযোগী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনের বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাই বহুল প্রচলিত, যেখানে অব্যবহৃত বিদ্যুৎ গ্রিডের মাধ্যমে বিক্রি করাকে (নেট মিটারিং) উৎসাহিত করা হয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিশেষজ্ঞ সাজেদ কামালের মতে, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্নভাবে অধিক পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহের যে বিপত্তি আগে ছিল, স্টোরেজ প্রযুক্তির নিয়ত আধুনিকায়ন এবং কমতে থাকা দামের কারণে তা এখন অনেকাংশেই দূরীভূত হয়েছে এবং এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা আরও সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় হয়ে উঠছে। সৌম্য দত্তের মতে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা ভবিষ্যতে স্থানীয় সম্পদ ও দক্ষতা নির্ভর স্থানীয় শিল্পের সহায়ক হয়ে উঠবে। বর্তমানে বিদ্যুৎ সংকটে ভুগতে থাকা গ্রামাঞ্চলেও শস্য প্রক্রিয়াকরণ ও হিমাগারের মত জরুরি সুবিধাও এর মাধ্যমে সহজে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার প্রযুক্তি যখন তার সম্ভাবনার সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করছে এবং নিয়ত নিজেকে প্রমাণ করে চলছে, তখন বাংলাদেশে এই খাতে অনুন্নয়নের কারণ আসলে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। আর তাই স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ুমণ্ডল ও জ্বালানি বিষয়ক প্রকল্পের পরিচালক অধ্যাপক মার্ক জি জ্যাকবসনের মতে, নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাধাটা মূলত সামাজিক ও রাজনৈতিক, প্রযুক্তিগত কিংবা অর্থনৈতিক নয়।

মওদুদ রহমান : প্রকৌশলী।
ই-মেইল : mowdudur@gmail.com
মাহা মির্জা : গবেষক।
ই-মেইল : maha.z.mirza@gmail.com
শোয়েব করিম : লেখক, অনুবাদক।
ই-মেইল : shoeb.karim.tl@gmail.com